সাহিত্য

চলচ্চিত্র ও কাজী নজরুল ইসলাম

কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্প-উপন্যাস নিয়ে যেমন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তেমনি তিনি নিজেও বেশ কিছু চলচ্চিত্রে পরিচালক, অভিনেতা, গায়ক, চিত্রনাট্যকার হিসেবে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এমনকী 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। এ নিয়ে লিখেছেন আবদুল আলীম।

আমরা কাজী নজরুল ইসলামকে একজন 'বিদ্রোহী কবি' ও যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবেই বেশি চিনি। অথচ আমরা অনেকেই জানি না তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক, সংগীতকার, সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা, গায়ক, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, পৃষ্ঠপোষক, প্রযোজক ও সংগঠক হিসেবে অর্থাৎ তিনি চলচ্চিত্রের মানুষ হিসেবে পেয়েছেন অভুতপূর্ব সাফল্য।

নজরুল মোট কতগুলো চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা এখনও পুরোপুরি বলা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ২০টি সিনেমায় প্রত্যক্ষ ও ২১টি সিনেমায় পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

সাধারণত বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে যেমন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তেমনি তিনি নিজেও সরাসরি যুক্ত ছিলেন অনেক চলচ্চিত্রের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের নাম 'ধূপছায়া'। এই 'ধূপছায়া'তে তিনি অভিনয়ও করেছেন।

তিরিশের দশকের শুরুতে নজরুল নিজের গাওয়া ও সুরারোপিত গানের জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই সময় চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন এবং যেসব অভিনেতা ও শিল্পী অভিনয় করবেন ও গান গাইবেন তাঁদের শুদ্ধ উচ্চারণ ও গান শেখানোর দায়িত্ব পালন করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিরিশের দশকে নজরুল পারসি মালিকানাধীন চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্সের 'সুর ভাণ্ডারী' পদে নিযুক্ত হন। এই পদটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, গান লেখা ও সুর করারও দায়িত্ব পালন করতে হত। ম্যাডান থিয়েটার্সে 'সুর ভাণ্ডারি' হিসেবে নজরুলের যোগদানের পরই পরীক্ষামূলকভাবে ৩০-৪০টি সবাক ও খণ্ডচিত্র নির্মিত হয়। ১৯৩১ সালে প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী'তে সুর ভাণ্ডারীর কাজ করেন নজরুল। নজরুলের সুরভাণ্ডারী নিযুক্ত হওয়ার সংবাদটি দৈনিক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৯৩১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপা হয়।

ম্যাডান থিয়েটার্স কোম্পানির আরও যেসব চলচ্চিত্রের সঙ্গে নজরুল যুক্ত ছিলেন সেই ছবিগুলো হল, 'জ্যোৎস্নার রাত' (১৯৩১), 'প্রহ্লাদ' (১৯৩১), 'ঋষির প্রেম' (১৯৩১), 'বিষ্ণুমায়া' (১৯৩২), 'চিরকুমারী' (১৯৩২), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৩২), 'কলঙ্ক ভঞ্জন' (১৯৩১), 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৩৩) এবং 'জয়দেব' (১৯৩৩) প্রভৃতি।

ম্যাডান থিয়েটার্স কোম্পানির উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম নির্বাক বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল' নির্মিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। ম্যাডান থিয়েটার্সই ১৯৩০-৩১ সালে প্রথম সবাক বাংলা সিনেমা নির্মানের উদ্যোগ নেয় বাণিজ্যিক কারণে। তখন সুর ভাণ্ডারীর কাজ করেন নজরুল।

১৯৩১ সালে বাংলা সবাক চিত্র 'জলসা'য় নজরুল নিজের একটি গান গেয়েছিলেন এবং 'নারী' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে নির্মিত 'কপাল কুণ্ডলা'য় যুক্ত ছিলেন গীতিকার হিসেবে।

ম্যাডান থিয়েটার্সের অন্যতম অংশীদার ছিলেন মিসেস পিরোজ ম্যাডান। তিনি পায়োনিয়ার ফিল্মস প্রযোজনা সংস্থা স্থাপন করেন ১৯৩৩ সালে। এই প্রযোজনা সংস্থা থেকে ১৯৩৪ সালে 'ধ্রুব' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা 'ধ্রুব চরিত' অবলম্বনে নির্মাণ করা হয় 'ধ্রুব' সিনেমাটি। সঙ্গীতবহুল মেলোড্রামা 'ধ্রুব' ছবিতে ১৮টি গানের মধ্যে ১৭টি গান ছিল নজরুলের লেখা এবং তিনি এর সংগীত পরিচালনাও করেন। তিনি দেবর্ষি নারদের চরিত্রে অভিনয় করেন এবং একটি গানে কণ্ঠও দেন। এই ছবিটি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনাও করেন নজরুল।

স্বর্গের সংবাদবাহক এবং দেবর্ষি নারদের কথা ভাবলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জটাধারী, লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট বৃদ্ধ একজনের চেহারা। আমরা বিভিন্ন সিনেমা বা নাটকে দেবর্ষি নারদকে এই চেহরাতে দেখেই অভ্যস্ত। সেই ইমেজ সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে দেখা গেল এক সুদর্শন যুবককে। চুড়ো করে বাঁধা ঝাকড়া চুল, তাতে ফুলের মালা, ক্লিন শেভড, পরনে সিল্কের লম্বা কুর্তা, গলায় মালা, হাসি হাসি মুখ। চলচ্চিত্রের পর্দায় এভাবেই নারদরূপে আবির্ভূত হলেন নজরুল। সেখানে অনবদ্য অভিনয় করেন কাজী নজরুল। একজন পোড় খাওয়া অভিনেতার থেকে কোনও অংশে কম যাননি তিনি। 'ধ্রুব' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারি মাসে।

নারদ চরিত্রের পৌরাণিক ইমেজ ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছিলেন নজরুল। ফলে নজরুলের সাজসজ্জা নিয়ে পত্রিকায় সমালোচনা হয়। একজন মুসলিম যুবক নারদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলে সেসময় বেশ বিতর্কও হয়েছিল। তার উপর বৃদ্ধ নারদের চিরাচরিত বেশভুষা পরিবর্তন করে দেওয়া। অনেকটা আগুনে ঘি ঢেকে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তবে নজরুল এইসব উটকো সমালোচনাকে পাত্তা দেননি। নজরুল জবাবে বলেন, 'আমি চিরতরুণ ও চির সুন্দর সকলের প্রিয় নারদেরই রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।'

নজরুল নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সেটাই ছিল

১৯৩৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধ্রুব' ছবির একটি দৃশ্যে কাজী নজরুল ইসলাম।

সিনেমাটির মূল আকর্ষণ। ম্যাডান থিয়েটারের মালিক জামশেদজি ফ্রামজী ম্যাডান এই ছবিতে নজরুলকে 'নারদ' এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বলেছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল এতে বক্স অফিসের আকর্ষণ বাড়বে। সিনেমাটি বহুদিন হাউসফুল ছিল। তবে এই প্রযোজনা সংস্থা বিভিন্নভাবে নজরুলের সঙ্গে প্রাপ্য পারিশ্রমিক নিয়ে প্রতারণা করে। ফলে নজরুল ১৯৩৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এরপর নজরুল আর নির্দিষ্ট প্রযোজনা সংস্থায় আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন সিনেমায় সংগীত পরিচালনা ও গান লেখার কাজে জড়িত হয়ে পড়েন।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পাতালপুরী' সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেন। পরিচালক ছিলেন তাঁরই বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজা ও নজরুল উভয়েই ছিলেন এই ছবির গীতিকার। 'পাতালপুরী' সিনেমাটি কয়লাখনির শ্রমিক ও সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। এই ছবির জন্য 'ঝুমুর' সুরে গান রচনা করেন নজরুল। সিনেমাটিকে আরও বাস্তবধর্মী করে তোলার জন্য নজরুল কয়লাখনি অঞ্চল সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

রহস্য কাহিনিভিত্তিক থ্রিলার চলচ্চিত্র 'গ্রহের ফের' ছবিতে সংগীত পরিচালক ও সুরকার ছিলেন নজরুল। ছবিটি ১৯৩৭ সালে মুক্তি পায়। এই ছবির সংলাপ লেখেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং ছবিটি পরিচালনা করেন চারু রায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'গৃহদাহ' সিনেমার সুরকার ছিলেন নজরুল। এ ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। ১৯৩৬ সালে ছবিটি মুক্তি পায়।

১৯৪১ সালে কাজী নজরুল 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রযোজনা সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ওস্তাদ মুহাম্মদ হোসেন খসরু, হুমায়ুন কবীর, এস ওয়াজেদ আলী, মুহাম্মদ মোদাব্বের, আজিজুল ইসলাম, সারওয়ার হোসেন, আজিজুল হক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ।

১৯৩৭ সালে নির্মিত শ্রেষ্ঠ ছবি ছিল 'বিদ্যাপতি'। এই ছবির মূল কাহিনিটি লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যদিও সিনেমাটির চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় ছিলেন দেবকী বসু। ছবিটিতে সুর দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ও রাইচাঁদ বড়াল। 'বিদ্যাপতি' সিনেমাটি লাহোর-মুম্বই-কলকাতা হয়ে সিলেট-ঢাকা-বরিশাল এবং রেঙ্গুনের বিভিন্ন সিনেমা হল পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির বিভিন্ন কবিতায় সুর দিয়েছিলেন কাজী নজরুল। তাঁর দেওয়া সুরগুলি ছিল অসাধারণ। বাংলায় 'বিদ্যাপতি' সিনেমাটি দারুন সাফল্য পায়, ফলে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দিতে রিমেক হয় 'বিদ্যাপতি'র। হিন্দিতেও সিনেমাটি ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়। হিন্দি ছবিটির সঙ্গেও কাজী নজরুল যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৮ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয় 'গোরা' সিনেমাটি। ছবিটির সংগীত পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন নজরুল। বিশ্বভারতীর আপত্তি ছিল যে সিনেমাটিতে রবীন্দ্রসংগীত বিকৃত করা হচ্ছে অর্থাৎ সঠিকভাবে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে না। নজরুল সোজা চলে যান কবিগুরুর কাছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কাছে সব শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'কি কাণ্ড বলতো? তুমি শিখিয়েছ আমার গান আর ওরা কোন আক্কেলে তার দোষ ধরেন? তোমার চেয়েও আমার গান কি তারা বেশি বুঝবে! আমার গানের মর্যাদা কি ওরা বেশি দিতে পারবে?'

নজরুল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু লিখিত অনুমতি না পেলে সামনের ঘোষিত তারিখে ছবিটার মুক্তি— দেওয়া যাবে না। আপনি দয়া করে আজ একসময় ছবিটা দেখুন— আমি প্রোজেক্টর ও ফিল্ম সঙ্গে করে এনেছি। তারপর অনুমতি পত্রে একটা সই করে দিন।'

বিশ্বকবি বললেন, 'ছবি দেখাতে চাও সকলকেই দেখাও, সবাই আনন্দ পাবে। আপাতত দাও, কীসে সই করতে হবে?' এই বলে নজরুলের হাত থেকে আগে থেকেই লিখে রাখা অনুমতি পত্র নিয়ে তাতে সই ও তারিখ দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনেই ছবিখানি যথারীতি মুক্তি পেল।

কবিগুরু নজরুল ইসলামকে তাঁর লেখা গান নিজের খুশিমতো গাইবার ও ব্যবহারের অনুমতিপত্র দিয়ে দেন। গোরাতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার হয় নজরুলের নিজস্ব শৈলীতে। নজরুলের এই নিজস্ব শৈলী শ্রোতারা দারুন প্রশংসা করে এবং গানগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়।

সে সময় 'হাল বাংলা' নামে আরেকটি বাংলা সিনেমা মুক্তি পায়। এই সিনেমার গানে সুর দিয়েছিলেন কাজী নজরুল। ছবিতে একটি কমেডি চরিত্রে অভিনয়ও করেন নজরুল।

১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সাপুড়ে' ছবিটির কাহিনি রচনা করেন নজরুল। এতে তিনি সুরও দিয়েছিলেন। পরিচালক ছিলেন দেবকী বসু। বেদে সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে নির্মিত ছবিটি দারুণ ব্যবসাসফল হয়েছিল। বেদে জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজী নজরুল বেশ কিছুদিন বেদে দলের সঙ্গে ছিলেন, যাতে সিনেমাটি আরও বাস্তবধর্মী করে ফুটিয়ে তোলা যায়। ছবিটি এতটাই ব্যবসাসফল হয়েছিল যে 'সাপেড়া' নামে এর হিন্দি রিমেকও করা হয়েছিল। হিন্দি ছবিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন নজরুল।

'রজত জয়ন্তী' (১৯৩৯) 'নন্দিনী' (১৯৪১) 'অভিনয়' (১৯৪১) 'দিকশূল' (১৯৪১) নামে বেশ কয়েকটি সিনেমার জন্য গান রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল। গানগুলো এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল সে সময় লোকের মুখে মুখে ফিরত। 'নন্দিনী' সিনেমাটির ৯টি গানের মধ্যে ১টি গানের রচয়িতা নজরুল হলেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর লেখা 'চোখ গেল চোখ গেল' গানটি আবহসংগীতরূপে ব্যবহার করা হয়। এই গানে কণ্ঠ দেন কিংবদন্তি সংগীত ব্যক্তিত্ব শচীন দেববর্মন। ছবিটির সংগীত পরিচালক না হয়েও গল্পের মুড বুঝে এসডি বর্মনের কণ্ঠে গানটি সহজসাধ্য করে তোলার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন তিনি।

'চৌরঙ্গী' (১৯৪২) ছবির গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। ছবিটি নিউ সিনেমায় হিন্দি ভার্সন মুক্তি পায় ১৯৪২ সালের ৪ জুলাই। এর পাঁচদিন পর নজরুল ৯ জুলাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাংলা 'চৌরঙ্গী' মুক্তি পায় রূপবাণীতে ১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। এই ছবির ৯টি গানের মধ্যে ৮টি গান তিনি লেখেন এবং সুর দেন। সিনেমাটি হিন্দিতে রিমেকও হয়। হিন্দি চৌরঙ্গীর ১৩টি গানের মধ্যে ৭টি গান নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। নজরুলের লেখা সেই গানগুলো ছিল— ১. চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী, ২. সারাদিন ছাদ পিটি, ৩. আ-জারি নিদিয়া, ৪. উহ্ করকে হায়, ৫. ক্যায়সে মিলান, ৬. হাম ইসকে মারোকা। গানের সুরও দিয়েছিলেন নজরুল।

একই বছর মুক্তি পায় 'দিলরুবা' ছবিটি। তাতেও গীতিকার ও সুরকার ছিলেন নজরুল। চৌরঙ্গী হিন্দিতে রিমেক হলে সে ছবির জন্য তিনি ৭টি হিন্দি গান রচনা করেন। সব মিলিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।

১৯৪১ সালে কাজী নজরুল 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রযোজনা সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ওস্তাদ মুহাম্মদ হোসেন খসরু, হুমায়ুন কবীর, এস ওয়াজেদ আলী, মুহাম্মদ মোদাব্বের, আজিজুল ইসলাম, সারওয়ার হোসেন, আজিজুল হক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ।

১৯৪১-৪২ সালে 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স'-এর ব্যানারে নজরুল নিজের গীতি আলেখ্য 'মদীনা' নামে একটি সিনেমার নির্মাণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 'মদিনা' ছবির চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। 'মদিনা' নাটকে ছিল মোট ৪৩টি গান কিন্তু 'মদিনা' ছবিটির জন্য নজরুল ১৫টি সংগীত রচনা করেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়ায় ছবিটি আর মুক্তি পায়নি।

১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স' একেবারে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মস্তিস্কের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দীর্ঘ ৩৪ বছর বাক্‌রুদ্ধ ছিলেন। ১৯৭৬ সালে নজরুলের মৃত্যু হয়। নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর ফিল্ম প্রোডাকশন হাউসটি বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে হাউসটির মূল কর্ণধার ছিলেন কাজী নজরুল।

অন্য দেশের গল্প

রেশমী জোড়া

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

বেগম সাহেবা বারান্দায় বসে পুত্রবধূর সঙ্গে খোশ গল্পে মেতে উঠেছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিচ্ছেন গরম চায়ের পেয়ালায়। পুত্রবধূ মাত্র দু'দিন আগে লন্ডন থেকে ফিরেছে। শাশুড়িকে শোনাচ্ছে সেখানকার নানা কাহিনি। কী কী দেখল সেখানে। কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কী কী শপিং করেছে ইত্যাদি।

আলাপের ফাঁকে পুত্রবধূ চেয়ারের পাশে রাখা একটি শপিং ব্যাগ শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়ে বলল: 'আম্মা! আপনার জন্য লন্ডন থেকে এই রেশমী জোড়াটি কিনেছি। এটি দিয়ে আপনি সালোয়ার-কামিজ বানিয়ে নেবেন। আর এই হচ্ছে দোপাট্টা, এই হচ্ছে একই রঙের সোয়েটার।'

বেগম সাহেবা খুব আগ্রহের সঙ্গে কাপড়গুলো নাড়াচাড়া করে দেখলেন এবং বললেন: 'রেশমী জোড়াটা তো ভারি সুন্দর! রংটাও খুব মায়াবী। কিন্তু বেটি! তুমি এত কষ্ট করতে গেলে কেন! আচ্ছা বলতো, এত দামি পোশাক পরার বয়স কি আমার আছে?'

'আম্মা! ভালো পোশাক পরার জন্য বয়সের কি কোনও বাধ্যবাধকতা আছে? কোনও কথা নয়। এটি দিয়ে আপনি শিগ্‌গির সালোয়ার-কামিজ তৈরি করে নিন। এবারের ঈদে এটিই পরতে হবে আপনাকে। নইলে আমি কিন্তু মন খারাব করব।' বউ মুচকি হেসে বলল।

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুখে-শান্তিতে রাখুন, তোমার এই সোহাগ অটুট থাকুক। বাচ্চাদের মন আনন্দ-উচ্ছলতায় ভরে উঠুক।' বউয়ের মাথায় সোহাগ-ভরা হাত বুলিয়ে শাশুড়ি দোয়া করতে থাকেন।

চার-পাঁচ দিন পরের কথা। বেগম সাহেবা বারান্দায় বসে খবরের কাগজে নজর বোলাচ্ছেন। হঠাৎ কাজের বুয়া হামিদার কণ্ঠ ভেসে এলো: 'বেগম সাহেবা! গোশতের সঙ্গে সবজি কি দেবো?'

বেগম সাহেবা কাগজের পাতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'হামিদা! তোমাকে অন্তত দশবার বলেছি, রান্না-বান্নার ব্যাপারে বউমাকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু আমার কথা যেন তোমার কানেই যায় না।'

'বেগম সাহেবা! আমার হচ্ছে বিপদ। আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি বউমার নিকট পাঠান আর বউমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আম্মাকে জিজ্ঞেস কর।' হামিদা হেসে দিয়ে বলল।

'ঠিক আছে। সবজির কথা পরে বলছি। এদিকে এস। আমার হাতটা একটু টিপে দাও। ভীষণ ব্যথা করছে।' বেগম সাহেবা বললেন।

বেগম সাহেবার হাত টিপে দিচ্ছে হামিদা আর নানা কথাবার্তা চলছে দু'জনের মধ্যে। বেগম সাহেবা বললেন: 'হামিদা, তোমার মেয়েটি কেমন আছে? কতদিন থেকে তাকে দেখছি না। সে কি আমার ওপর রাগ করেছে?'

'তওবা তওবা, কি যে বলেন বেগম সাহেবা! যে মেয়ে আপনাদের নুন-নিমক খেয়ে বড় হয়েছে, সে আপনার ওপর রাগ করবে এটা কীভাবে সম্ভব।' হামিদা কম্পিত কণ্ঠে কান ছুঁয়ে কথাগুলো বলল, বেগম সাহেব হেসে দিয়ে বললেন: 'তাহলে সে আজকাল আমার কাছে কেন আসে না?'

'বেয়াদবি নেবেন না বেগম সাহেবা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটা একেবারে মাথার ওপর এসে পড়েছে কি-না তাই মেয়েটা রাত-দিন পড়ালেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর হ্যাঁ, একটি কথা আপনাকে বলাই হয়নি। মেয়েটির জন্য একটি সম্বন্ধ এসেছে। ঈদের দিন তারা আসবে দিনক্ষণ ঠিক করতে। ভাবছি সম্বন্ধটা ভালোই। কথাটা পাকা হয়ে যাক।'

'তুমি ঠিকই ভাবছ, কিন্তু কিছুটা প্রস্তুতিও তো প্রয়োজন, তা কতটুকু কী করেছ?' বেগম সাহেবা দরদমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। 'বেগম সাহেবা, আমাদের গরিবদের আবার প্রস্তুতি কী! বাপহারা মেয়ে। বাপ বেঁচে থাকলে হয়তো কিছু প্রস্তুতি থাকত। চিন্তা করছি, বিয়ের দিন পরার জন্য সাদামাটা ধরনের একজোড়া সালোয়ার-কামিজ তৈরি করে দেব আর মেহমানদের জন্য কিছু চা-নাশ্‌তার ব্যবস্থা করব।' হামিদা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে কথাগুলি উচ্চারণ

করল।

'ঠিক আছে। এবার রান্না ঘরে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের হেফাযত করুন। এক কাজ কর। গোশতের সঙ্গে বুটের ডাল মিশিয়ে রান্না কর। আর হ্যাঁ একটি কথা। মেয়েটির সালোয়ার-কামিজ তৈরি করার আগে আমার সাথে পরামর্শ করবে অবশ্যই।' বেগম সাহেবা কাগজটি হাত থেকে রাখতে রাখতে কথাগুলো বললেন। হামিদা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল।

রহমত ও বরকতের সওগাত নিয়ে এসেছিল মাহে রামাদান। এখন বিদায় নিকটবর্তী। চারদিকে চলছে ঈদের প্রস্তুতি। সবাই ঘরদোর গোছাচ্ছে। চলছে পরিচ্ছন্ন অভিযান। মার্কেটের জাঁকজমক বেড়েছে চতুর্গুণ। নবরূপে সাজানো হয়েছে দোকান-পাট। চারদিকে শুধু আলোর ঝলকানি। মানুষের ভিড়ে পথ চলা ভার। মুহূর্ত অবসর নেই দর্জিদের।

রোযার ঊনত্রিশতম দিন শেষ। চাঁদ দেখার অপেক্ষায় সবাই উদ্‌গ্রীব। ঊনত্রিশ চাঁদের মজাই আলাদা। অবশেষে চাঁদ দেখা গেল। চারদিকে শুরু হল আনন্দের ধ্বনি। মাঝে মাঝে পটকার আওয়াজও কানে আসছে। গোটা পাড়া মুখরিত হয়ে উঠল আনন্দ উল্লাসে। ঈদের নামায শেষে নাতি-নাতনীরা এসে বেগম সাহেবা ও তার স্বামীকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। ঈদের সেলামি চায় সবাই। কিছুক্ষণ পর ছেলে ও ছেলের বউ এলো ঈদের সালাম জানাতে। শাশুড়িকে দেখেই বউ বলে উঠল, 'আম্মা! আপনার সঙ্গে আমি কোনও কথাই বলব না। আমার মনে ভারি কষ্ট। আমার দেওয়া রেশমী জোড়াটি আপনি পরলেন না কেন?'

'আমি খুব ভাল করেই জানি, আমার আদরের বউটি যখন এর কারণ জানতে পারবে তখন তার সব মনের কষ্ট দূর হয়ে যাবে।' এই বলে বেগম সাহেবা মুচকি হেসে বউকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন।

বউ-শাশুড়ির মাঝে কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময় হামিদা এসে সালাম করে বলল, 'ফরিদার বিয়ের অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। অতিথিরা এসে পড়ার আগেই সে চায় বেগম সাহেবা ও বৌমাকে সালাম জানাতে।'

'তাই নাকি! কোথায় সে। তাকে ভেতরে ডাকছো না কেন? বেটি ফরিদা, এসো ভেতরে এসো।' বেগম সাহেবা ভেতর থেকে ডাকলেন।

ফরিদা ভেতরে প্রবেশ করে বেগম সাহেবা ও তাঁর ছেলের বউকে সালাম করল। ফরিদার দিকে নজর পড়তেই বউতো অবাক! শাশুড়িকে দেওয়া রেশমী জোড়াটি ফরিদার গায়ে শোভা পাচ্ছে। বেগম সাহেবা ফরিদাকে আদর করে গলার সঙ্গে মিলিয়ে বলল: 'বাহ! ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমাকে! আল্লাহ্ তোমাকে সুখী করুন। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।' হামিদা মেয়ে ফরিদাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে বউ বলল: 'আচ্ছা! ব্যাপারটা তাহলে এই!'

'বউমা, আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, ফরিদার এই শুভলগ্নে পরার জন্যই বুঝি এই রেশমী জোড়াটি এসেছে। তাই কোনও কিছু না ভেবেই হামিদার হাতে তা তুলে দিয়েছি।— আমার বিশ্বাস ছিল এতে তুমি নাখোশ হবে না।' মুচকি হেসে বেগম সাহেবা বললেন।

'আম্মা! আপনি খুবই ভালো কাজ করেছেন। আপনার খুশিই তো আমার খুশি।' শ্রদ্ধা ভরে শাশুড়ির হাতে চুমু খেয়ে কথা কয়টি বলল পুত্রবধূ।

বেগম সাহেবা মুখে আর কোনও কথা বললেন না। কিন্তু তাঁর স্মৃতিপটে তখন বারবার ভেসে উঠছিল মহানবী সা.-এর একটি বাণী: 'ইয়াতিমের ভার বহনকারী জান্নাতে আমার এতটা নিকটবর্তী থাকবে যেমন এই আঙ্গুল দু'টো' এই বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল উঁচু করে দেখালেন।

সূত্র : উর্দু ডাইজেস্ট